facebook.com/groups/BoiLoverspolapan
facebook.com/shebaprokashoni.fanpage

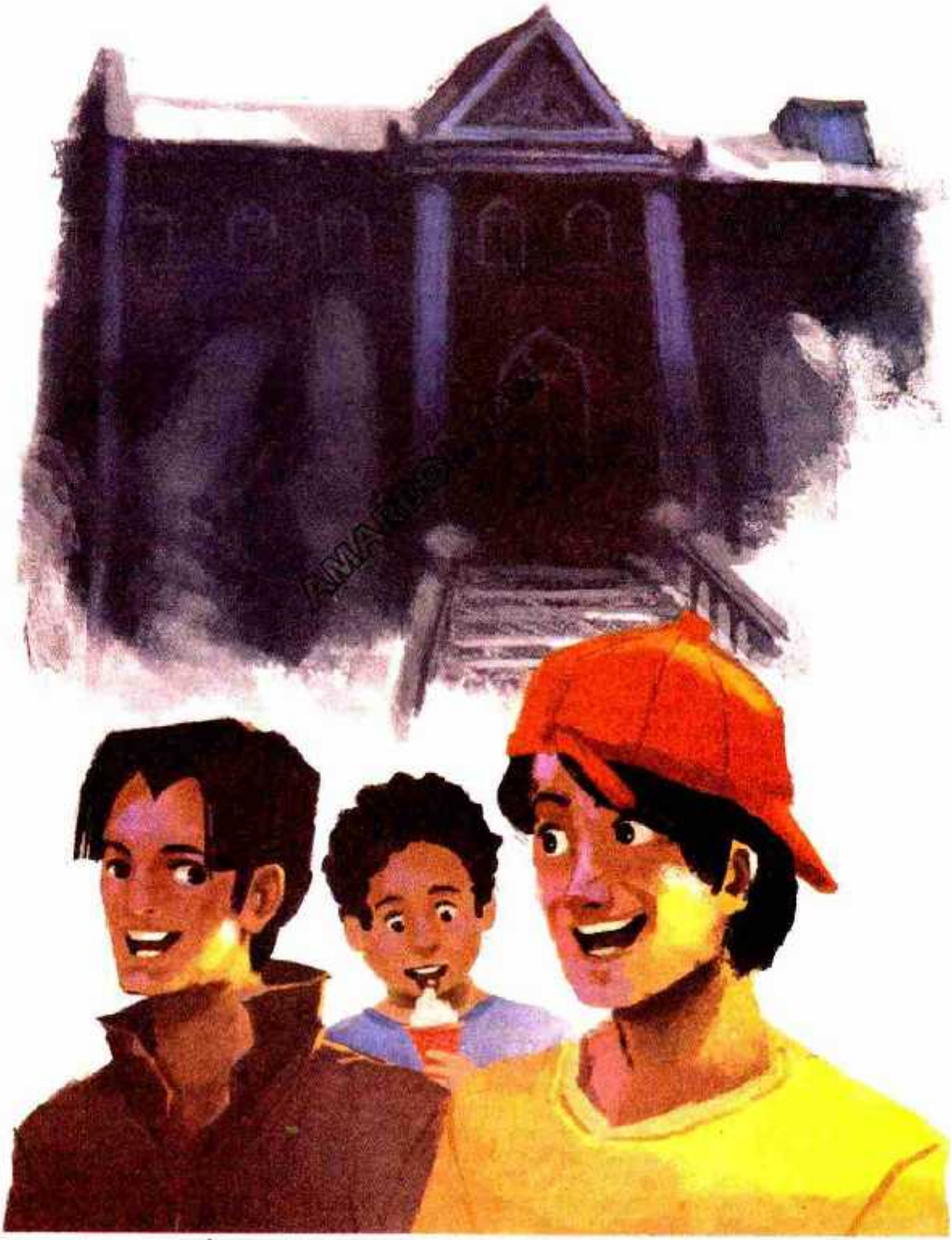

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচিত্রকরণ : সব্যসাচী মিস্ত্রী

AMARBOI.COM

রকিব হাসান

গোয়েন্দা কিশোর-মুসা-রবিন

নীল অর্কিডের ভূত

'কিশোর, কাজকর্ম আছে নাকি কিছু হাতে?' এক সকালে নাশতার টেবিলে জিজ্ঞেস করলেন ওর চাচা রাশেদ পাশা।

'নাহ্, একেবারে বেকার,' জবাব দিল কিশোর। 'স্কুলও ছুটি। বসে থাকতে থাকতে গায়ে-গতরে ব্যথা হয়ে গেল।'

মুচকি হাসলেন চাচা। 'তাহলে আমি তোকে কাজ দিতে পারি।'

'দাও,' উত্তেজিত কণ্ঠে কিশোর বলল। 'কী করতে হবে?'

'একটা বাড়ি দেখতে যেতে হবে।'

দপ করে নিভে গেল কিশোর। 'দূর! ওসব আমি পারব না। বাড়ি দেখে কী হবে?'

'গ্রামের বাড়ি। বাগান আর পুকুরসহ। গ্রিনহাউসও আছে,' রাশেদ পাশা বললেন।

'থাক গে। আমার ওসবে উৎসাহ নেই।'

'বাড়িটা আমি কিনতে চাই।'

নিস্পৃহ কণ্ঠে কিশোর বলল। 'কিনে ফেল।'

'সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কিনতে চাইছে না। তাই ভাবলাম, আমিই কিনি,' রাশেদ পাশা বলল।

'কিনতে চাইছে না কেন?' এক কান খাড়া করে ফেলেছে কিশোর।

'সেটাই তো রহস্য। বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে,' চাচা বললেন।

পলকে উজ্জ্বল হয়ে গেল কিশোরের চোখ। 'ভূতের উপদ্রব আছে মানে?'

'বলছি, বলছি,' মিটিমিটি হাসছেন রাশেদ পাশা। 'কিছুদিন হলো ওই বাড়ির মালিক মারা গেছেন। সুন্দর সুন্দর অর্কিডের চাষ করতেন তিনি। মোজিলা অর্কিডের নাম শুনেছিস?'

'শুনেছি। আজকাল বিয়েতে ওই ফুলের তোড়া খুব ব্যবহার হয়। এখনকার বিয়ের কনেরা মোজিলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

অর্কিড ভালোবাসে।'

'ঠিক,' রাশেদ পাশা বললেন। 'মিস্টার মোজিলার নামেই মোজিলা অর্কিডের নাম হয়েছে। তিনি আর তাঁর স্ত্রী মিলে খুব ভালো ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন। তারপর হঠাৎ শুরু হলো ঝামেলা। কারা যেন তাঁদের কাচ ভাঙতে লাগল, বাজারে পাঠানোর জন্য রেডি করে রাখা ফুল চুরি করতে লাগল, নষ্টও করতে লাগল। ভয়ানক করে তুলল পরিস্থিতি। হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন মিসেস মোজিলা। এর কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রীর পথ ধরলেন স্বামীও। একবার ওই বাড়ি থেকে কিছু পুরোনো মাল কিনেছিলাম, সেই থেকেই তাঁদের সঙ্গে পরিচয়। তাঁদের ছেলেমেয়েরা শহরে থাকে। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। গ্রিনহাউসে ফুলের ব্যবসায় যেতে চায় না। তা ছাড়া বাড়িটার একটা কুখ্যাতিও হয়ে গেছে। লোকে বলে, ওখানে ভূত আছে, ভূতেরাই ওসব কুকর্ম করছে।'

'লোকে তো এমনই। অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখলেই, ভালোমতো তলিয়ে না দেখে ভূতের ওপর দোষ চাপায়,' কিশোর বলল। 'বিষয়টা আমার কাছেও বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে। তবে আমি ভয় পাই না। তোমার সঙ্গে যেতে রাজি আছি।'

চাচা-ভাতিজা বেরোতে যাবে, এই সময় সেখানে এসে হাজির কিশোরের কুকুর টিটু। প্রথমে কুঁইকুঁই করল, তারপর ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাতে লাগল।

'কিরে টিটু, তুইও যেতে চাস,' বলল কিশোর। বাইরে এসে গাড়ির দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে লাফিয়ে উঠে বসল টিটু। ওকে পেছনের সিটে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসল কিশোর। রাশেদ পাশা বসলেন ড্রাইভিং সিটে।

গাড়ি চালালেন তিনি। কিশোরের সঙ্গে অর্কিড নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। রাশেদ পাশা বললেন, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অনেক দেশেই আজকাল অর্কিডের চাষ হয়। তবে সবার আগে এটা আবিষ্কার হয়েছিল মালয়েশিয়ায়। ওখান থেকেই কয়েক ধরনের অর্কিড নিয়ে এসেছিলেন মিস্টার মোজিলা। তারপর গ্রিনহাউস বানিয়ে বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ শুরু করেন।

'আমাদের স্কুলের মালির কাছে শুনেছি,' কিশোর বলল, 'গোপনে নাকি পাঢ় নীল এক ধরনের অর্কিড ফোটানোর চেষ্টা করছিলেন মিস্টার মোজিলা। কাজটাতে প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিলেন, এ সময় হঠাৎ করে তাঁর মৃত্যু ঘটে।'

'তাই নাকি?' অবাক হলেন রাশেদ পাশা। 'আমিও তো জানি বিষয়টা। গোপন ব্যাপারটা তার মানে আর গোপন থাকেনি। কিন্তু মোজিলার ছেলেমেয়েরা জানে বলে তো মনে হলো না।'

দুই

কিছুক্ষণ পর গ্রিনহাউসের গেটের কাছে পৌঁছালেন রাশেদ পাশা। দুটো পাথরের পিলার দেখতে পেলেন। একটাতে খোদাই করে লেখা রয়েছে বাড়িটার নাম, 'অর্কিডিয়ানা'। গেট দিয়ে একটা ছায়াঢাকা ড্রাইভওয়েতে ঢুকে গাড়ি থামালেন রাশেদ পাশা।

জায়গাটাকে ছবির মতো সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন মোজিলারা। চাষ করা ফুল তো রয়েছেই, এখানে-ওখানে অসংখ্য বুনো ফুলও বাতাসে দোল খাচ্ছে। দেখে মুগ্ধ হলো কিশোর। বাড়িটার দিকে তাকাল।

'চাচা, তুমি তো বলেছিলে ছোট্ট বাড়ি!' কিশোর বলল। 'কিন্তু এখন তো দেখছি প্রাসাদ। শুধু জানালাগুলো পরিষ্কার করতেই এক সপ্তাহ লেগে যাবে।'

রাশেদ পাশা জানালেন, সারা বাড়িতে বাস করেননি মোজিলা দম্পতি। শুধু মাঝখানের কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন। বাড়ির একটা প্রান্তকে বানিয়েছিলেন অর্কিডের শোরুম। অন্য প্রান্তে মালিরা থাকে।

মালি যে আছে, সেটা জানান দিতেই যেন ঠিক ওই মুহূর্তে বাঁ প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। বেঁটে, গোলগাল, কালো চুলওয়ালা লোকটা কাছে এসে নিজের পরিচয় দিল হেনরি স্মিথ বলে।

'আমি কিশোর পাশা, আর উনি আমার চাচা রাশেদ পাশা,' জবাব দিল কিশোর। 'দারুণ সুন্দর জায়গা। পুরোটা ঘুরে দেখার জন্য তর সইছে না আমার।'

'আমি বড় গ্রিনহাউসটায় যাচ্ছি,' মালি বলল। 'ওটা আগে দেখতে চাও, নাকি বাড়িটা?'

চাচার দিকে তাকাল কিশোর। মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'গ্রিনহাউসেই যেতে চাই,' মালির দিকে ফিরে বলল কিশোর। 'যেতে যেতে ভূতটার ব্যাপারে যা যা জানেন, আমাকে বলুন।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মালি। কিশোরের মনে হলো কাপড়ের নিচে লোকটার কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকি খেল। কয়েক সেকেন্ড কোনো কথা বলল না লোকটা। তারপর যেন নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিল, 'ও, গুজবটা তাহলে শুনেছ? ওসবে কান দিয়ো না। গুজব গুজবই। ফালতু। গ্রিনহাউসে ভূতটুত কিছু নেই।'

আর কিছু বলল না কিশোর। চাচার সঙ্গে লোকটাকে অনুসরণ করল ও। মস্ত একটা গ্রিনহাউসের কাছে এসে দাঁড়াল। গম্বুজ আকারের একটা বাড়ি, পুরোটাই কাচের তৈরি। কোথাও ভাঙা দেখা গেল না। নিশ্চয় মেরামত করে ফেলা হয়েছে।

স্মিথের পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকল দুজন। সঙ্গে সঙ্গে সামনে এগিয়ে এল অল্পবয়সী একজন লোক। স্মিথ পরিচয় করিয়ে দিল, 'ও ডিডি। আমার সহকারী।'

নাম শুনে লোকটাকে হাওয়াইয়ের অধিবাসী মনে হলো কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি পলিনেশিয়ান? ওখান থেকে আমেরিকায় এসেছিল আপনার পূর্বপুরুষেরা?'

'হ্যাঁ,' লোকটা জানাল।

সুন্দর ফুলগাছের সারির মাঝখান দিয়ে চাচার সঙ্গে এগোল কিশোর। বাতাসে নাক টানতে টানতে কিশোর বলল, 'এত মিষ্টি গন্ধ কিসের? নিশ্চয় অর্কিডের নয়?'

'নাহ্। আমরা কয়েক জাতের গোলাপের চাষও করি এখানে,' ডিডি জবাব দিল। 'স্থানীয় ফুলের বাজারে বিক্রি করি ওগুলো।'

সারির শেষ মাথায় একটা দরজা দেখা গেল। ওপাশে ঘর আছে, দরজায় একটা সাইনবোর্ড ঝোলানো, তাতে লেখা : প্রবেশ নিষেধ।

'ওখানে কী আছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওটা গবেষণাগার,' ডিডি জানাল। এর বেশি আর কিছু বলল না ও।

নিশ্চয় গোপন অর্কিডের গবেষণা হয় ওখানে, ভাবল কিশোর। ফুলের গবেষণা হয়, নাকি অন্য কিছু? বৈধ না অবৈধ? জানবে কী করে? মনের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে ভাবনাগুলো।

'কিশোর, বাকি জায়গাগুলো দেখা দরকার,' রাশেদ পাশা বললেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরোনোর জন্য এগোলেন। পেছনে পেছনে চলল কিশোর।

বাইরে এসে একটা ছোট পিকআপে চড়ল স্মিথ ও ডিডি। রাশেদ পাশা আর কিশোরকে উঠতে বলল। তারপর নিয়ে চলল ঔপনিবেশিক আমলের চমৎকার বাড়িটা দেখাতে।

বাড়ির সামনে এসে পিকআপ থেকে নামল ওরা। ভেতরে ঢুকে চমকে গেল কিশোর। মস্ত এক রাজকীয় হলঘর থেকে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ভূতুড়ে মূর্তি। লম্বা সাদা চুল, বরফসাদা মুখ, পরনে সাদা শিফন কাপড়ের তৈরি ঢোলা গাউন। ডান হাতে একটা সাদা কাচের টিউব, সেটা থেকে নীল রঙের ফোঁটা ফোঁটা তরল পদার্থ ঝরে পড়ছে।

ঘড় ঘড় করে এমন একটা শব্দ বেরিয়ে এল স্মিথের গলা থেকে, মনে হলো গলা টিপে ধরেছে কেউ। ঘুরেই দিল দৌড়। অস্ফুট একটা চিৎকার দিয়ে বসকে অনুসরণ করল ডিডি। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর রাশেদ পাশা। ধীরে ধীরে ওদের দিকে এগিয়ে এল মূর্তিটা। সিঁড়ির গোড়ায় নেমে, কোনো কথা না বলে, নিঃশব্দে চলে গেল সিঁড়ির নিচে। অদৃশ্য হয়ে গেল।

'গেল কোথায়?' প্রশ্ন করলেন রাশেদ পাশা।

সিঁড়ির নিচের একটা দরজা দেখাল কিশোর। দৌড় দিল সেদিকে। টান দিয়ে দরজার পাল্লা খুলে অন্য পাশে তাকাল। দেখতে পেল না ভূতটাকে। দরজার ওপাশ থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে।

সিঁড়িতে এক ধাপ নেমে এল কিশোর। এ সময় এসে খপ করে ওর হাত চেপে ধরলেন রাশেদ পাশা। 'না না, যাসনে। আগে বোঝা দরকার।'

'ছাড়ো, চাচা, দেরি করলে ভূতটা চলে যাবে। এসো আমার সঙ্গে।' সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দেয়াল হাতড়ে সুইচ বের করে টিপে দিল কিশোর। আলোয় ভেসে গেল ঘরটা। মাটির নিচের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
facebook.com/shebaprokashoni.fanpage

দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ভুতুড়ে মূর্তি

একটা ঘর। বেজমেন্ট।

অবাক হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে দুজন। কয়েক সেকেন্ড পরই হাঁচি দিতে শুরু করল। জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে। ছাতা পড়া। ভুতটাকে দেখতে পেল না।

স্তব্ধ হয়ে বেজমেন্টে দাঁড়িয়ে রইল দুজন। দেখে মনে হলো, একটা রোদবিহীন গ্রিনহাউস। কয়েক সারি বেঞ্চ সাজানো। সেগুলোতে রাখা অসংখ্য টব। টবের মাটির নিচে কোনো চারা বা বীজ আছে কি না বোঝা গেল না, তবে ওপরে কোনো গাছ বা ফুল নেই। আঙুল দিয়ে একটা টবের মাটিতে খোঁচা মারল কিশোর। খুদে একটা বাল্বের মতো জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করল।

'অর্কিড!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'মনে হয় এখানে কেউ অর্কিডের ফুল ফোটানোর চেষ্টা করছে।'

হাসলেন রাশেদ পাশা। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন। 'কিশোর, বাড়িটা কেনার ব্যাপারে আরও শিওর হলাম আমি। যাও-বা একটু খুঁতখুঁতানি ছিল, তা-ও চলে গেছে। তবে রহস্যটা মনে হচ্ছে খুব জটিল। সমাধান করতে পারবি তো?'

মৃদু হাসল কিশোর। 'না করা পর্যন্ত হাল ছাড়ব না, এটুকু কথা দিতে পারি তোমাকে, চাচা। চলো, ওপরে উঠি। ওই নীল রংটা পরীক্ষা করতে হবে। জরুরি সূত্র মনে হচ্ছে এটাকে।'

ওপরের হলঘরে ফিরে এল আবার দুজন। টিউব থেকে নীল রঙের ফোঁটা পড়তে দেখেছে মেঝেতে। সেগুলো খুঁজতে লাগল কিশোর। একটা ফোঁটা দেখতে পেয়ে, আঙুলের মাথায় লাগিয়ে প্রথমে শুঁকে দেখল। তারপর পকেট থেকে টিস্যু পেপার বের করে মুছে নিল তরলটা। 'আঠার মতো আঠালো,' চাচাকে শুনিয়ে বিড়বিড় করে বলল যেন নিজেকেই। 'কোনো ধরনের গাছের রস হতে পারে, তাতে নীল রং মেশানো হয়েছে।'

এ কারণেই মিস্টার মোজিলা তাঁর নীল অর্কিড ফোটাননি তো? ভাবল কিশোর।

সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল ও। দোতলায় এসে প্রধান বেডরুমটা খুঁজল। ভেতরের বিছানা দেখে সেটা চিহ্নিত করল। ছোট ছোট খুপরিওয়ালা একটা পুরোনো ডেস্ক রয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। আর একটা র‍্যাক রয়েছে। ডেস্কের ওপরে এলোমেলো হয়ে আছে কাগজের স্তূপ। র‍্যাক ভর্তি নানা ধরনের রাসায়নিকের বোতল। প্রতিটিতে নম্বর দেওয়া।

কিশোরের মনে হলো নম্বরগুলো গবেষণার ক্রমউন্নতির চিহ্ন। লক্ষ করল নিচের দিকের নম্বরওয়ালা বোতলগুলোতে রয়েছে হালকা সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ তরল। কোনোটাতেই নীল রং নেই। তাহলে ভূতের হাতের টিউবটা এল কোথা থেকে?

হতভম্ব হয়ে ঘরের ভেতরে ঘুরে বেড়াতে লাগল কিশোর। সূত্র খুঁজছে তার চোখ। খুঁজতে খুঁজতে ডেস্কের ওপর একটা কার্ড দেখতে পেল, যাতে লেখা রয়েছে 'নীল রঙের ফর্মুলা'। পড়তে গিয়ে দেখল বেশি জটিল। মুখস্থ করা খুব কঠিন।

এখানে কোথাও একটা ল্যাবরেটরি রয়েছে, ভাবল ও। একটা দরজার ওপর চোখ পড়ল। পাশের ঘরে যাওয়ার। ঠেলা দিয়ে পাল্লাটা খুলল ও। হ্যাঁ, ল্যাবরেটরিই। এবং বেশ ভালোমতো সাজানো। তবে গোছানোর যন্ত্রপাতিভরা ঘরটার কোথাও কোথাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

অগোছালো দেখে বোঝা যায়, ইদানীং ব্যবহার করা হয়েছে এটা।

ভূতটা নিশ্চয় কাজ করছিল এখানে। তারপর গাড়ির ইঞ্জিন আর লোকের সাড়া পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে বেরিয়ে আসে। কাকতালীয়ভাবে ওদের সামনে পড়ে যায়। আরও বেশি ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে যায় সিঁড়ির নিচের কোনো গোপন রাস্তা দিয়ে।

ভূতটা যে ভূত নয়, মানুষ, নিশ্চিত হলো কিশোর। ভূতের সাজ নিয়েছে। কিন্তু কেন? কে ও? তবে যে-ই হোক, অর্কিডের গোপন ফর্মুলা নিয়ে যে আগ্রহী হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ফর্মুলাটা চুরি যেতে পারে, এই ভয়ে পকেট থেকে একটা ছোট হাইস্পিড ক্যামেরা বের করল কিশোর। রহস্যের কথা শুনে, কাজে লাগতে পারে ভেবে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। ক্যামেরা দিয়ে কার্ডে লেখা ফর্মুলাটার ছবি তুলতে লাগল দ্রুত। হঠাৎ পেছনে একটা শব্দ কানে এল।

ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখে স্মিথ দাঁড়িয়ে আছে। হিসিয়ে উঠল সে। কিশোরের কবজি চেপে ধরে ধমকে উঠল, 'কী করছ?'

ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল।

রাশেদ পাশাকে হলঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'ওপরে কী আছে?'

চাচাকে জানাল কিশোর। হাসলেন তিনি। 'বাহ্, এসেই পেয়ে গেছিস। ফর্মুলাটা মোজিলার ছেলেমেয়েদের কাছে নিশ্চয় মূল্যবান হবে।'

'চাচা,' ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'স্মিথকে আমার সন্দেহ হয়। তোমার?'

'হয়। তবে কিসের সঙ্গে জড়িত, বুঝতে পারছি না।'

রহস্যটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কথা খেলে গেল কিশোরের মাথায়। সিঁড়িতে দেখা ভূতটার কথা। চেহারাটা স্পষ্ট দেখেছে। সুন্দর চেহারা।

'চাচা,' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মোজিলার কেসটার সঙ্গে কোনো মেয়েমানুষের সম্পর্ক আছে নাকি, জানো তুমি?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাতিজার দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'মনে হয়, জানি। বাড়ির দলিলটা দেখেছি আমি। মোজিলার উইলও দেখেছি। বাড়ি বিক্রির কিছু টাকা ডিডির স্ত্রীকে দিতে বলা হয়েছে। মোজিলার সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করত ও। স্মিথকে যা দিতে বলা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি দিতে বলা হয়েছে ডিডির বউকে। স্মিথের বউকে এক কানাকড়ি দেওয়ার কথাও লেখা নেই। এটা রাগিয়ে দিয়ে থাকতে পারে স্মিথকে।'

'হুঁ, তা ঠিক,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বেশ ভালোমতোই রেগেছে।'

হঠাৎ আবার একটা কথা মনে হতেই বেডরুমে ফিরে এল কিশোর। সাবধানে দরজা খুলে ল্যাবরেটরিতে উঁকি দিল। স্মিথ চলে গেছে। সূত্র খুঁজতে শুরু করল কিশোর। একটা ডেস্কের ড্রয়ার সামান্য খোলা দেখে টান দিয়ে খুলল সেটা। ভেতরে পাওয়া গেল একটা সাদা রঙের পরচুলা।

ভূতের মাথার, ভাবল ও। তুলে নিল ওটা। পরচুলার ক্যানভাসের লাইনিংয়ে ছাপ দিয়ে খুদে অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে '২৩লোমাক্স ১০৯।

হাসল কিশোর। ভাড়া করে আনা হয়েছে পরচুলাটা, রকি বিচের লোমাক্স বিউটি স্যালুন থেকে। পরচুলাটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিয়ে, ড্রয়ারটা আগের মতো করে লাগিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নিচে নেমে এল চাচার কাছে।

গাড়িতে ওঠার পর চাচাকে জানাল সূত্রটার কথা।

তিন

রকি বিচে ফিরে লোমাক্স বিউটি স্যালুনের সামনে এসে চাচাকে গাড়ি রাখতে বলল কিশোর। গাড়ি থেকে নেমে স্যালুনে ঢুকল।

'কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল কাউন্টারে দাঁড়ানো মহিলা।

'একটা পরচুলা ভাড়া করতে চাই, সাদা রঙের, যেটা একজন তরুণী মহিলাকে দিয়েছেন আপনারা,' কিশোর বলল। 'কোন ধরনের পরচুলা, বলছি। রেজিস্টার দেখুন। নম্বরটা হলো ২৩লোমাক্স ১০৯।'

'ব্যাপারটা আমার কাছে তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না,' মহিলা বলল। 'তরুণীর নাম কী?'

'জানি না। একটা থিয়েটারের পেছনের সাজঘরে গিয়ে পরচুলাটা দেখেছি আমি।'

একটা বাক্সে রাখা কার্ডে আঙুল চালাল মহিলা। দেখে দেখে একটা কার্ড টেনে বের করল। 'এটা একটা স্পেশাল অর্ডার। তুমি যদি চাও, তাহলে তোমাকেও একটা বানিয়ে দেওয়া যাবে।'

'বানাতে কত সময় লাগবে?' জানতে চাইল কিশোর।

'দুই সপ্তাহ। তবে একটা পরচুলা সম্ভবত স্টকে আছে, ভাড়া দেওয়ার মতো।'

গলা বাড়িয়ে দিল কিশোর। মহিলার হাতের কার্ডে লেখা নামটা দেখল। অবাক হলো না। কার্ডের কোনায় লেখা রয়েছে 'স্মিথ'। তার মানে, ওর ধারণাই ঠিক। স্মিথরা স্বামী-স্ত্রী মিলেই কাজটা করছে। ভূত সেজেছে মিসেস স্মিথ।

'ভাড়া নেব, না নতুন একটা নেব, আমি আপনাকে জানাব।' তারপর মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে এল কিশোর।

চাচার কাছে ফিরে এল ও। মাথায় ভাবনার ঘূর্ণি। রহস্যটা নিয়ে ভাবছে। হঠাৎ করেই নতুন আরেকটা বুদ্ধি এল তার মাথায়।

'চাচা,' বলল ও, 'বাড়ি চলো। ছোট গাড়িটা নিয়ে আবার বেরোব আমি। মুসা আর রবিনকে সঙ্গে নেব। ওদেরসহ ফিরে যাব মোজিলার বাড়িতে। কিছুটা সময় কাটাব। কী বলো?'

'আমার কোনো আপত্তি নেই,' রাশেদ পাশা জবাব দিলেন। 'স্মিথরা ঢুকতে দিতে না চাইলে আমাকে ফোন করিস। আর কোনো ঝামেলা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাস।'

ইয়ার্ডে ফিরে ছোট গাড়িটা নিয়ে আবার বেরোল কিশোর, সাধারণত ও যেটা বেশি চালায়। প্রথমে রবিনদের বাড়ি থেকে ওকে তুলে নিল। রহস্যটার কথা শুনে সমাধান করার জন্য অস্থির হয়ে উঠল রবিন। মুসাকে তুলে নেওয়ার পর ও যখন ভূতের কথা বলল, বেঁকে বসল, ও বাড়িতে যাবে না।

'তুমি জানো, ভূতকে আমি ভীষণ ভয় পাই,' কিশোরকে বলল ও। 'তার পরও আমাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'ঠিক আছে, চলো তাহলে, তোমাকে তোমাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসি,' কিশোর বলল। 'মজাটা আমি আর রবিনই তাহলে করিগে। রবিন, চলো, আগে একটা খাবারের দোকানে যাই।'

সঙ্গে সঙ্গে মত পরিবর্তন হয়ে গেল মুসার। 'কোথায় যাবে? "চিকেন"-এ? চলো, আমিও যাব। ভূতের আমি থোড়াই কেয়ার করি। পেট ভরা থাকলে ভূত আমার কচু করবে।'

মুচকি হাসল কিশোর। রবিন হা হা করে হেসে উঠল। তাতে অবশ্য কিছু মনে করল না মুসা।

মুদির দোকান থেকে কিছু কাঁচা খাবার কিনল কিশোর, রান্না করে খাওয়ার জন্য। তারপর বিকেল পাঁচটা নাগাদ রওনা হলো মোজিলার বাড়ির উদ্দেশে।

বাড়িটার ভেতরে যখন ঢুকল, চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'কী দারুণ সুন্দর! কিশোর, তোমার চাচা এটা কিনলে তো পিকনিক করার জন্য আর কোথাও যাওয়া লাগবে না আমাদের।'

তবে মুসা খুশি হতে পারল না। 'কিন্তু আমি ভূতের সঙ্গে বাস করতে পারব না, যত সুন্দর বাড়িই হোক।'

পাড়ি রেখে বাড়িতে ঢুকল ওরা। রান্না করে, রাতের খাবার সেরে এসে, বসার ঘরে টিভি দেখতে লাগল। একটু পরই গোধূলির ছায়া অন্ধকারে রূপ নিল। রাত নামল। এর ঠিক কয়েক মিনিট পরই তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল।

লাফ দিয়ে উঠে চেয়ারে দুই পা তুলে দিল মুসা। 'খাইছে, কিসের চিৎকার?'

'কিছু না, বিড়াল,' জবাব দিল রবিন।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কালো বিড়াল,' মুসা বলল। কোনোমতেই অশুভ কোনো কিছু কিংবা ভূতের চিন্তা থেকে সরতে রাজি নয় ও।

থেমে থেমে চলতেই থাকল চিৎকারটা। একটা টর্চ তুলে নিয়ে জানালার বাইরে উঁকি দিল কিশোর। হেসে বলল, 'নাহ্, মুসা, তোমার অনুমান একেবারেই ঠিক নয়। বিড়ালটা ধবধবে সাদা।'

'সাদা হলেই যে ওটাতে প্রেতাত্মা ভর করতে পারবে না, জোর দিয়ে বলার উপায় নেই,' মুখ গোমড়া করে মুসা বলল। 'যা-ই হোক, ওটার ওই ভয়ানক চিৎকারটা থামলেই আমি খুশি হই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

রবিন বলল, 'ওটার গায়ে পানি ছোড়ো। শুনেছি, বিড়ালের গায়ে পানি ছুড়লে পালিয়ে যায়।'

গ্লাস থেকে পানি ছুড়েই বিড়ালটাকে তাড়াতে হলো শেষ পর্যন্ত।

ভয় দূর করার জন্য টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে মন দেওয়ার চেষ্টা করল মুসা। অনুষ্ঠানে প্রায় ডুবে গেছে, হঠাৎ আবার চমকে উঠতে হলো ওদের। দড়াম করে বন্ধ হলো সামনের একটা জানালা।

'আশ্চর্য!' ভুরু কুঁচকে বলল রবিন। 'একটু বাতাসও তো নেই।'

জানালার কাছে দৌড়ে এল কিশোর। অস্ফুট শব্দ করে উঠল।

'কী হয়েছে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ভূত!' জবাব দিল কিশোর।

দেখার জন্য ওর পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। লম্বা সাদা চুল উড়িয়ে, লম্বা সাদা গাউন নাচিয়ে, লনে হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা সাদা মূর্তি। মাঝেমধ্যে নেচে উঠছে। তারপর মাথা নুইয়ে এমন ভঙ্গি করছে, যেন সামনে বসে দর্শকেরা ওর নাচ দেখছে।

'কাছে গিয়ে দেখব,' কিশোর বলল। ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। জানালা দিয়ে দেখতে লাগল রবিন আর মুসা। কৌতূহল দমাতে না পেরে মুসাও উঠে এসেছে। দুজনই দেখল, নিঃশব্দে দ্রুতপায়ে ভূতটার দিকে এগিয়ে চলেছে কিশোর। কিন্তু ভূতটাও দেখে ফেলেছে ওকে। নাচতে নাচতে ওটাও দ্রুত সরে যাচ্ছে।

'দাঁড়ান! দাঁড়ান! আপনার সঙ্গে কথা আছে আমার!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

থামার বদলে চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল ভূতটা। দৌড়াতে শুরু করল কিশোর। ভূতটাও দৌড়াতে লাগল। বড় গ্রিনহাউসটার দিকে যাচ্ছে ভূতটা। ছুটে ভেতরে ঢুকে দরজা আটকে দিল।

গ্রিনহাউসের পাশের একটা ছাউনিতে ঢুকল কিশোর। ওটার ভেতর দিয়ে ছুটে ঢুকল মূল বাড়িতে। ভূতটাকে কোথাও দেখতে পেল না। ভূতটা কি পোশাক বদলানোর জন্য মূল বাড়িতে ঢুকেছে?

চার

গ্রিনহাউস থেকে বেরোনোর আগে প্রতিটি বেঞ্চের নিচে, ছাউনির কোণে, ফুলের ঝাড়ের আড়ালে টর্চের আলো ফেলে দেখল কিশোর। কাউকে লুকিয়ে থাকতে দেখল না। মূল বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবল ও। ওখানে গিয়ে খুঁজবে ভূতটাকে। কিন্তু এবারও নিরাশ হতে হলো ওকে।

কী করা যায়? ভাবতে লাগল ও।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। দোতলার সেই ঘরটায় উঠে এল, যেখানে সাদা পরচুলাটা দেখেছিল। ল্যাবরেটরির দরজা খোলা। তবে ভেতরে কেউ নেই। ড্রয়ারটা খুলে দেখল, যেখানে পরচুলাটা ছিল, সেখানেই পড়ে আছে ওটা। ছুঁয়ে দেখল। গরম। তার মানে সামান্য আগে এটা পরেছিল কেউ।

এই সময় ছোটখাটো একজন মহিলা ঘরে ঢুকল। পরনে নাইটি আর ড্রেসিং গাউন। 'এখানে কী? কে তুমি? ও দাঁড়াও দাঁড়াও, চিনতে পেরেছি। তুমি কিশোর পাশা, ডিটেকটিভ, ছোঁক ছোঁক করা সেই টিকটিকি।'

এসব কথার জবাব না দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি মিসেস স্মিথ?'

'সেটা জেনে তোমার কোনো কাজ নেই। এখানে এলে কেন? বেরোও। আর কখনো ঢুকবে না।'

'আপনাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিই,' শীতল কণ্ঠে কিশোর বলল, 'এ বাড়িটা আপনার নয়। মোজিলাদের।'

কটমট করে ওর দিকে তাকাল মহিলা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তুমি ভাবছ, এখানকার গোপন রহস্যের তুমি সমাধান করে ফেলবে। কোনো দিনও তা পারবে না।'

ওদিকে কিশোর কোথায় গেছে ভেবে অবাক হচ্ছিল মুসা ও রবিন। খুঁজতে খুঁজতে দোতলায় এসে উঠল। জোরে জোরে কথার শব্দ শুনে দেখতে এল। দেখে, কিশোরকে ধাক্কা দিয়ে ল্যাবরেটরি থেকে বের করে দিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দেওয়া হলো।

'কিশোর, কী হয়েছে?' জানতে চাইল মুসা।

ঠোঁটে আঙুল রেখে জোরে কথা বলতে নিষেধ করল কিশোর। তারপর ওকে অনুসরণ করতে ইশারা করল। বারান্দা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। একটা টেবিলে একটা টেলিফোন দেখতে পেল কিশোর। ওকে দেখেই যেন কাকতালীয়ভাবে বাজতে আরম্ভ করল। সামান্য দ্বিধা করে রিসিভার তুলে নিল কিশোর।

কানে ঠেকাতেই ভেসে এল একজন মানুষের গলা, জিজ্ঞেস করল, 'কে, মিসেস স্মিথ?'

প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে যেন কিশোরের ভাবনাগুলো। রিসিভারে একটা রুমাল চাপা দিয়ে মিসেস স্মিথের কণ্ঠ যতটা সম্ভব নকল করে জবাব দিল, 'হ্যাঁ। নতুন কিছু?'

'আপনার স্বামীকে বলবেন ওর প্রস্তাবে আমি রাজি।'

'ভালো, মিস্টার...' জবাব দিল কিশোর। লোকটার নামটা কীভাবে জানা যায় ভাবছে।

'ও, ভুলে গেছেন? হ্যামিলটন। মার্টি হ্যামিলটন। ইস্টভিলের মার্টিকে সবাই চেনে, তাই বলছি, কাউকে কিছু বলবেন না, কাউকে জানাবেন না।

'আচ্ছা, মনে থাকবে,' কিশোর বলল। 'আর, আপনাকে ধন্যবাদ।'

অন্য পাশের লোকটা লাইন কেটে দিতেই চাচাকে ডায়াল করল কিশোর। লোকটার সঙ্গে কী কী কথা হয়েছে, জানাল। পরদিন সকালে গাড়ি চালিয়ে নিজেই এসে হাজির হলেন রাশেদ পাশা। তাঁর কাছে জানা গেল, ইস্টভিল গ্রিনহাউসের প্রেসিডেন্ট মার্টি হ্যামিলটন, বড় একজন পাইকারি ফুল বিক্রেতা। মোজিলা ছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। আর কোনোমতেই তাঁর নীল অর্কিডের ফর্মুলা হ্যামিলটনের কাছে বিক্রি করতে রাজি হননি।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'স্মিথ তার কাছে ফর্মুলাটা বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা মেরে দিতে চাইছে না তো, কী মনে হয় তোমার, চাচা? পুরো ফর্মুলাটা যদিও জানার কথা নয় তার। কারোরই জানার কথা নয়।'

'সে রকমই তো মনে হচ্ছে,' জবাব দিলেন রাশেদ পাশা। 'তুই ওর বাড়াভাতে ছাই দিয়েছিস, কিশোর। তদন্ত করে বাগড়া দিচ্ছিস। তবে থামিসনে, কাজ চালিয়ে যা। দেখা যাক, আর কী বেরোয়। ফর্মুলার বাকি অংশটা হয়তো গবেষণা করে নিজেই বের করে নিতে পারবে। নইলে হ্যামিলটনের কাছে বিক্রি করতে চাইত না। দেখি, ইতিমধ্যে আমি নিজে হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলব।'

চাচা চলে গেলে, একটা ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। দুই সহকারীকে বলল, 'চলো, ডিডির সঙ্গে কথা বলি।'

গ্রিনহাউসের ওয়ার্কশপে পাওয়া গেল ডিডিকে। বড় একটা বাক্স থেকে গোলাপি রঙের অর্কিড ফুল বের করছে। 'কী সুন্দর!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'কোত্থেকে এল এগুলো?'

'হাওয়াই,' জবাব দিল ডিডি। 'আমার পরিবারের জন্মানো। মোজিলা কোম্পানি যখন কোনো বড় অর্ডার পায়, আমার পরিবারকে জানাই, তারাই এসব ফুলের চাষ করে, ফুল জন্মিয়ে, এখানে পাঠিয়ে দেয়।'

তরুণ লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ডিডি, কখনো কোনো ফুলের রং বদলানোর জন্য রাসায়নিক পরীক্ষা করেছেন আপনি? কিংবা ফুলের রং বদলানোর জন্য রাসায়নিক ব্যবহার করেছেন?'

'না, কখনো করিনি। তবে কেউ ফর্মুলা বানিয়ে দিলে চেষ্টা করে দেখার ইচ্ছে আছে।'

'আমার কাছে আংশিক ফর্মুলা আছে,' জানাল কিশোর। 'ফুলগাছের ঘন আঠার সঙ্গে নীল রং মিশিয়ে অর্কিডের ডাঁটার রসে মিশিয়ে দিলে কী ঘটবে?'

'চলো, কোল্ড রুমে যাই,' আগ্রহের সঙ্গে বলল ডিডি।

প্রবেশ নিষেধ লেখা রয়েছে যে ঘরটায়, সেটাই কোল্ড রুম। ঘরের খানিকটা জুড়ে রয়েছে গবেষণার সরঞ্জাম, সারি সারি তাক, সেগুলোতে টেস্ট টিউব আর অন্যান্য সরঞ্জাম। বেঞ্চের ওপর রাখা নানা ধরনের কাজ করার যন্ত্রপাতি। বালতি আর নানা আকারের বোতলও আছে।

'রাসায়নিক তরলগুলো কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

একটা আলমারির দরজা খুলল ডিডি। ভেতরে বেশ কয়েকটা তাক। আর সেগুলোতে নানা রকম তরল পদার্থ ভরা শিশি-বোতল।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল কিশোর। ক্যামেরা দিয়ে তোলা ফর্মুলার ছবির প্রিন্ট, দোতলার ল্যাবরেটরিতে যেটার ছবি তুলেছিল। ওটা পড়ে, আলমারি থেকে লেবেল দেখে দেখে তিনটা বোতল বের করল। একটাতে রয়েছে লাল রং, একটাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করল পাপড়ির রং

নীল, আর একটাতে গাছের রস। একটা টেস্ট টিউবে দুটো রঙের বোতল থেকেই খানিকটা করে রং ঢালল ও, তার সঙ্গে পানি মেশাল। সুন্দর গাঢ় বেগুনি রং হয়ে গেল তরলটা। হতাশ হলো কিশোর।

'গাঢ় নীল বানাব কীভাবে?' ডিডির দিকে তাকাল কিশোর।

মাথা নেড়ে জবাব দিল ডিডি, 'আমি জানি না। তবে এ রংটাও তো সুন্দর।'

রংটাকে নষ্ট না করে একটা বোতলে ঢালল কিশোর। তার সঙ্গে খানিকটা গাছের রস মেশাল। সেটা থেকে খানিকটা তরল একটা সাদা অর্কিডের বোঁটায় ঢেলে দিল। কিশোর গভীর মনোযোগে লক্ষ করতে লাগল। ডিডিও তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করল পাপড়ির রং। প্রথমে হলো ফ্যাকাশে বেগুনি, তারপর ঘন থেকে ঘনতর হতে লাগল।

কিশোর যখন ফুলের রং পরীক্ষা করছে, মুসা আর রবিন তখন গ্রিনহাউসে। ফুল আর গাছপালা দেখছে। হঠাৎ মুসার হাত চেপে ধরল রবিন।

'কেউ আসছে!' ফিসফিস করে বলল ও। একজন মহিলাকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখল। 'কিশোরকে সাবধান করে দেওয়া দরকার!'

কোল্ড রুমের দিকে ছুটল দুজন।

মহিলাও ছুটে এল। দেখে ফেলেছে ওদের। পেছন থেকে চিৎকার করে বলল, 'ওই ঘরে ঢুকবে না, খবরদার!'

কান দিল না ওরা। ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল রবিন। সাবধান করে দিল কিশোর ও ডিডিকে। বিড়বিড় করল কিশোর, 'মিসেস ডিও!' দরজার পাল্লা লাগিয়ে দিল ও।

ওকে ঠেলে সরিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করল মহিলা। না পেরে রাগে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি তোমাকে দেখে নেব!'

পাশের দেয়ালে লাল একটা হুইল রয়েছে, তার নিচে লেখা : টেম্পারেচার কন্ট্রোল। চাকাটা ঘোরাতে শুরু করল ও। 'শূন্য'-তে নিয়ে গেল। রবিন বুঝল, ওটা ফ্রিজিং মার্ক। অর্থাৎ, ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা এখন ভীষণভাবে নেমে যাবে।

'এই বার শিক্ষা হবে ওদের,' মহিলা বলল। কুটিল হাসি হাসল রবিন ও মুসার দিকে তাকিয়ে। 'ওটাকে থামানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না। যন্ত্রটা অটোমেটিক। বারো ঘণ্টা পর আগের তাপমাত্রায় ফিরে আসবে, তখন আপনাআপনি দরজার তালা খুলে যাবে। তার আগে খোলা যাবে না। ওটা এখন বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।'

বলে দৌড়ে বেরিয়ে গেল গ্রিনহাউস থেকে।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, 'ঘরের ভেতরে থেকে ঠান্ডায় জমে মারা যাবে এখন কিশোর!'

লাফ দিয়ে গিয়ে চাকাটার সামনে দাঁড়াল রবিন। 'ওই ডাইনিটার কথা আমি একবিন্দু বিশ্বাস করি না। মুসা, তুমি দরজায় ধাক্কা দিতে থাকো।'

হুইল ঘুরিয়ে ওটাকে আবার 'নরমাল' লেখা ঘরে আনার চেষ্টা করল রবিন। পারল না। চাকাটাকে ঘোরাতে হলে কোনো একটা বোতাম টিপতে হবে। সেই বোতামটা খুঁজে পেল না, যেটা টিপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকাটাকে 'অনলক' করতে হয়। সময় কেটে যাচ্ছে। তবে অবশেষে মুসাই খুঁজে পেল বোতামটা। চাকাটার অন্য পাশের দেয়ালের একটা সুইচ বোর্ডে। টিপে দিল ওটা।

খুলে গেল কোল্ড রুমের দরজা। টলতে টলতে বেরিয়ে এল কিশোর ও ডিডি। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে। কী ঘটেছে, জানাল ওদের মুসা ও রবিন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

ডিডি বলল, 'অমূল্য অর্কিডগুলোকেও বাঁচালে তোমরা।'

'আর আমরাও বাঁচলাম!' যোগ করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল মুসা ও রবিন। 'কিন্তু আমরা এখন কী করব?' মুসার প্রশ্ন।

'ওই ভয়ংকর মহিলাটার ব্যাপারেই বা কী করা যায়?' প্রশ্ন রবিনের।

'একটা বুদ্ধি বের করেছি,' জবাব দিল কিশোর। 'এখন আমরা এখান থেকে চলে যাব। তবে রাতে ফিরে আসব আবার, গোপনে।'

দুই সহকারীকে নিয়ে গ্রিনহাউস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। গাড়িতে উঠে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে।

'তোমার প্ল্যানটা কী?' জানতে চাইল মুসা।

'ভূতটাকে ওর নিজের জায়গায় পরাজিত করব।' এর বেশি আর কিছু বলল না কিশোর।

পাঁচ

রকি বিচ শহরে ঢুকে প্রথমে লোম্যাক্স বিউটি স্যালুনের সামনে গাড়ি থামাল ও। ভেতরে ঢুকল। কাউন্টারে বসে থাকা মহিলাকে বলল, সাদা পরচুলাটা ভাড়া চায়। সঙ্গে একটা পরিচারিকার পোশাক। হালকা গোলাপি রঙের একটা পোশাক পাওয়া গেল। এতেই চলবে। জিনিসগুলো প্যাক করে দিতে বলে, ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিল। ফিরে এল গাড়িতে।

মুসা আর রবিনকে ওদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ইয়ার্ডে ফিরে এল কিশোর। গাড়ি রেখে ঘরে ঢুকে সোজা নিজের বেডরুমে চলে এল। আলমারি খুলে ছোট একটা ব্যাগ বের করল। তাতে ভরে রাখল প্যাকেটটা।

খাওয়া শেষ করে ব্যাগটা নিয়ে আবার বেরোল ও। আবার বাড়ি থেকে তুলে নিল মুসা ও রবিনকে। ফিরে চলল অর্কিডিয়ানায়। কী করতে চায়, জানতে চাইল ওর দুই সহকারী।

কিশোরের উদ্দেশ্য আর প্ল্যানটা শোনার পর রবিন বলল, 'তুমি শিয়োর হচ্ছ কী করে যে গ্রিনহাউসের ভূতটা লনে বেরোবেই?'

'যদি না বেরোয়, তো ওটাকে কৌতূহলী করে টেনে বের করে আনার দায়িত্ব তোমার,' কিশোর বলল।

গোধূলি বেলায় পরচুলা আর গাউন পরে গ্রিনহাউসের দিকে চলে গেল কিশোর। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল মুসা আর রবিন। অবশেষে সাদা চুলওয়ালা ভূতটা বেরিয়ে এল বাইরে, হাতে একটা শিশি, তাতে গাঢ় রঙের কোনো জিনিস। লনে গিয়ে নাচতে আরম্ভ করল ভূতটা, মুখখোলা শিশি থেকে তরল পদার্থ ছলকে পড়তে লাগল ঘাসের ওপর।

এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে মূর্তিটা, লক্ষ্যহীনভাবে। গ্রিনহাউসের কাছে একটা ঝোপের আড়ালে বসে কিশোরও দেখতে পাচ্ছে। ওর মনে হলো, বেরোনোর সময় হয়েছে। লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে বেরিয়ে এল লনে। ভূতটাকে নকল করে সে-ও নাচতে নাচতে চলে এল লনের মাঝখানে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে, দুই হাত সামনে বাড়িয়ে, ভয়ংকরভাবে গুঙিয়ে উঠল, যেন আরেকটা ভূত।

ঘুরে তাকাল সাদা ভূতটা। কিশোরকে দেখে ভয়ানক এক চিৎকার দিয়ে ছুটে চলে গেল ঘরের মধ্যে। তৈরিই ছিল মুসা আর রবিন। জানালার কাছ থেকে ছুটে এসে হলঘরের সিঁড়ি আগলে দাঁড়াল।

'গুড ইভনিং, মিসেস স্মিথ,' হাসিমুখে বলল রবিন।

তার সঙ্গে যোগ করল মুসা, 'আপনি খুব ভালো নাচতে পারেন।'

বিস্ময় আর ভয় একসঙ্গে খেলে গেল মহিলার মুখে। 'তোমরা, তোমরা আমাকে চেনো?'

এ সময় সামনের দরজা দিয়ে ঢুকল কিশোর। নাচের ছন্দে হাঁটার সময় ওর ঢোলা গাউনটা এমনভাবে ঝাঁকি খেতে লাগল, অস্পষ্ট আলোয় মনে হলো পায়ে হেঁটে নয়, বাতাসে ভেসে ভেসে ঢুকছে ও।

'আপনার খেলা শেষ, মিসেস স্মিথ,' কিশোর বলল। 'আপনি আর আপনার স্বামী মোজিলার গোপন ফর্মুলাটা চুরি করে আরেকটু হলেই পার পেয়ে যাচ্ছিলেন। আপনার ভূতের নাটক মানুষকে ভয় দেখিয়ে এ বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখছিল...আর এই সুযোগে ফর্মুলার শেষ অংশটাও গবেষণা করে শেষ করে আনছিলেন আপনারা। কাজটা শেষ হয়ে গেলেই বিক্রি করে দিয়ে পুরো টাকাটা নিয়ে কেটে পড়তেন।'

'উঁহু, চুরির কথাটা ঠিক নয়,' মহিলা বলল। 'মিস্টার মোজিলা মৃত্যুর আগে ফর্মুলাটা আমাদের দান করে দিয়ে গেছেন।'

'বেশ, সেটা আদালতে গিয়েই প্রমাণ করবেন,' কিশোর বলল।

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মিসেস মোজিলার মুখ।

এই সময় ঘরে ঢুকল ডিডি। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল ভূত দুটোর দিকে। অবশেষে চিনতে পারল কিশোরকে।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিশোরের হাত চেপে ধরল। 'আমি ওটা আবিষ্কার করে ফেলেছি। এসো, দেখে যাও।'

ডিডির পেছনে পেছনে এসে গ্রিনহাউসে ঢুকল কিশোর। গর্বিত ভঙ্গিতে হাত তুলে দেখাল ডিডি। একটা সুন্দর নীল অর্কিড ফুটে থাকতে দেখা গেল।

'বাহ্, ভীষণ সুন্দর তো!' অবাক হয়ে ফুলটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'কী করে করলেন?'

'রঙের মিশ্রণটার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তখন, হঠাৎই মনে পড়ল,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে জবাব দিল ডিডি। 'তবে এবার ভুললেও আর অসুবিধে হবে না। দেখো, লিখে রেখেছি। ফর্মুলার শেষ অংশটা আবিষ্কার করে ফেলেছি আমি, তাই না?'

'হ্যাঁ। আর এটা নিয়ে গর্ব করতে পারেন আপনি,' হেসে বলল কিশোর। 'এ বাড়ির পরের মালিক যে হবে, সে আপনাকে চাকরিতে বহাল দেবে, বেশি বেতন দিয়ে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই আমার।'

'বুঝেছি, পরের মালিক তোমার চাচাই হবেন,' ডিডি বলল। 'হতে পারে।'

'চাকরিতে থাকতে আমার কোনো আপত্তি নেই,' ডিডিও হাসল। 'তবে এক শর্তে, লনের মধ্যে ভূতের নাচন আর চাই না। ওসব দুষ্ট জিনিসগুলোকে তাড়াতে হবে এখান থেকে।'

হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। গেটের দিকে চলে যাচ্ছে গাড়িটা। গ্রিনহাউস থেকে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা আর ডিডি। গাড়িটাকে দেখল। চেঁচিয়ে উঠল ডিডি, 'স্মিথরা পালিয়ে যাচ্ছে!'

নিজেদের গাড়ির কাছে দৌড়ে এল তিন গোয়েন্দা। দেখল, চাকাগুলো বসা। বুঝতে পারল, স্মিথরাই এ কাজ করেছে, চাকার বাতাস বের করে দিয়ে গেছে, যাতে ওদের অনুসরণ করতে না পারে গোয়েন্দারা। চাকা বদলে ওদের পিছু নিতে সময় লাগবে। ততক্ষণে অনেক দূর চলে যাবে স্মিথরা।

হতাশ হয়ে মুসা বলল, 'দূর, ওদের আটকে রেখে আগে পুলিশকে ফোন করা উচিত ছিল।'

'হুঁ, ভুলই হয়ে গেছে,' মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলল কিশোর। 'যাকগে, যাবে কোথায়? কোনো না কোনো একদিন ধরা পড়তেই হবে।'

ছয়

এর কয়েক দিন পর, এক সন্ধ্যায় পার্কে ব্যায়াম করতে এসেছে কিশোর। অনেকেই ব্যায়াম করছে। কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ-বা অন্য কিছু করছে।

লম্বা সাদা আলখেল্লা পরা, মাথা হুডে ঢাকা, মুখ পুরোপুরি আড়াল করা একটা মূর্তিকে দৌড়াতে দেখে অবাক হলো কিশোর।

জগিংয়ের জন্য অদ্ভুত পোশাক। এ রকম কাপড় পরে কেউ কখনো ব্যায়াম করে না।

একটা নিরালা জায়গায় এসে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল মূর্তিটা। একটা ভাঁজ করা কাগজ গুঁজে দিল কিশোরের হাতে। দৌড়াতে দৌড়াতেই দ্রুত কাগজটার ভাঁজ খুলে ফেলল কিশোর। লেখার কালিটা রহস্যময়ভাবে ফিকে হয়ে গেছে। চোখের কাছে এনে পড়ল ও। লেখা রয়েছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর, জ্বলন্ত লাল ঘোড়াওয়ালা শূন্য খামারে গিয়ে ওদের খুঁজে বের করো—পারিবারিক ভূত।

'আপনি কে?' লেখাটা পড়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। কিন্তু ভুতুড়ে মূর্তিটা নেই। উধাও হয়েছে।

ধড়াস করে উঠল কিশোরের বুক। একটা হার্টবিট মিস হয়ে গেল। অদ্ভুত কিছু কল্পনা করল না তো ও?

না, করেনি। হাতের কাগজটাই তার প্রমাণ।

হুড পরা ভূতটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু গোধূলির ছায়ায় হারিয়ে গেছে ওটা। দৌড়াতে দৌড়াতে জগারদের জিজ্ঞেস করল ও, হুডওয়ালা আলখেল্লা পরা কাউকে দেখেছে কি না। বেশির ভাগই 'না' বলল, তবে দুজন লোক হাত তুলে বনের দিকে দেখিয়ে দিল। একজন বলল, 'ওদিকে গেছে।'

বনের কাছে ছুটে এল কিশোর। কিন্তু লোকটাকে দেখতে পেল না। ফেরার জন্য ঘুরতে যাবে, আবার ধড়াস করে এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ড। দুটো গাছের আড়ালে পলকের জন্য সাদা একটা মূর্তিকে দেখেছে বলে মনে হলো তার। দৌড়ে এল সেখানে। তবে আর কিছু চোখে পড়ল না।

উদ্বিগ্ন হয়ে দুই জগারের কাছে ফিরে এল ও। গেটের দিকে ছুটল। দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে এল বাড়িতে।

লিভিং রুমে টিভির সামনে বসে থাকতে দেখল মেরি চাচিকে। মুখ তুলে কিশোরকে হাঁপাতে দেখে অবাক হলেন তিনি।

'কিশোর, কী হয়েছে? মুখ এমন সাদা কেন? বেশি দৌড়ে ফেলেছিস নাকি? বোস। বসে বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি আসলে একটা ভূত দেখেছি, চাচি। পিছু নিয়েছিলাম, কিন্তু ধরতে পারলাম না।'

'ভূত, না চোর?'

'ভুতুড়ে মূর্তি বললেই ভালো হয়।' যা যা ঘটেছে, চাচিকে জানাল কিশোর।

'অবাক কাণ্ড...' কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলেন মেরি চাচি।

'কিসের অবাক কাণ্ড?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'তোর এই ঘটনার সঙ্গে একটা খবরের কাকতালীয় মিল রয়েছে,' মেরি চাচি জবাব দিলেন।

'কী খবর?'

'দুটো ছেলেমেয়ে—ভাইবোন ওরা, বয়স আট আর দশ, হারিয়ে গেছে। ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হারিয়েছে, না কিডন্যাপ করা হয়েছে, জানা যায়নি। পুলিশের কাছে কোনো তথ্য নেই।'

'কোথায় জানলে?'

'টেলিভিশনে।'

'আশ্চর্য!' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'তার মানে, চাচি, তুমি বলতে চাও, ওই ভুতুড়ে মূর্তিটা এই বাচ্চা নিখোঁজের ব্যাপারে কিছু জানে? নাকি অন্য কোনো বাচ্চার ব্যাপারে বলেছে?'

'বলতে পারে,' হাসলেন মেরি চাচি। 'তবে আমার মনে হয়, নোটটা দিয়ে তোকে এই রহস্যের সমাধান করে দিতেই অনুরোধ করে গেছে ভুতুড়ে মূর্তিটা।'

'বাহ্, তোমারও দেখি আজকাল রহস্যের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে,' হেসে বলল কিশোর। 'ভাবছি, তোমার কথাটা ঠিকও হতে পারে।' টেলিভিশনের দিকে ঘুরে তাকাল ও। খবরটা আবার বলে কি না শোনার জন্য কান পেতে রইল। বলল না। রিমোট টিপে আরও কয়েকটা খবরের চ্যানেল দেখল। কিন্তু কোনোটাতেই আর বাচ্চাদের নিখোঁজ হওয়ার খবরটা বলল না।

রিমোটটা চাচির হাতে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। ভাবতে লাগল, কী করবে ও? ভুতুড়ে মূর্তিটা যে সূত্র দিয়ে গেছে ওর হাতে, সেটার ওপর কাজ করবে? নাকি ভূতটাকে আবার দেখার অপেক্ষা করবে? কয়েক মিনিট পর ফোন তুলে নিয়ে রবিনকে ফোন করল ও।

'রবিন, পার্কে আজ একটা ঘটনা ঘটেছে,' কিশোর বলল। 'কাল কি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?'

'পারব। নতুন রহস্য নাকি?'

'মনে হয়। কাল সকাল দশটায় বাড়ি থেকে তোমাকে তুলে নেব। মুসা কি ফ্রি আছে? জানো নাকি কিছু?'

'জানি। কাল ও ব্যস্ত থাকবে।'

সাত

পরদিন সকালে কিশোরের গাড়িতে উঠেই কী ঘটেছিল জানতে চাইল রবিন। কোথায় যাচ্ছে ওরা? কেন?

'একটা নির্জন গোলাঘর খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, যেটার ওপর একটা জ্বলন্ত লাল ঘোড়া বসানো আছে।'

'খুঁজে বের করা কঠিন হবে,' রবিন বলল।

'ঘটনাটা কী?'

'আমি এখনো বলতে পারব না। তবে হারিয়ে যাওয়া দুটো ছেলেমেয়ে থাকতে পারে ওখানে।'

'তা-ই? আর ওদের উদ্ধার করার জন্য আমার সহযোগিতা চাইছ?'

'হ্যাঁ।'

'কিডন্যাপিং কেস মনে হচ্ছে তোমার? জিম্মিপণ কত টাকা চেয়েছে?'

তখন ভুতুড়ে মূর্তিটার কথা জানাল কিশোর, যেটা ওর হাতে নোটটা গুঁজে দিয়ে গেছে। 'বাড়ি ফিরে চাচির কাছে জানলাম, টেলিভিশনে নাকি দুটো ছেলেমেয়ে নিখোঁজ হওয়ার কথা বলেছে। দুই আর দুইয়ে চার করার চেষ্টা করলাম। মনে হলো, ভুতুড়ে মূর্তিটা এই ছেলেমেয়েগুলোর কথাই বলেনি তো? হয়তো অকারণেই যাচ্ছি আমরা...'

'সেটা কোথায়?' বাধা দিল রবিন।

'জানলে তো ভালোই হতো,' জবাব দিল কিশোর। 'চোখ খোলা রাখো। লাল ঘোড়া চোখে পড়লে বোলো।'

শহর থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামের পথে ঢুকে গেল কিশোর। কয়েক মাইল যাওয়ার পর একটা গোলাঘর চোখে পড়ল। নির্জন মনে হলো।

'ওই যে দেখো!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'একটা ষড়ভুজ লাগানো চিহ্ন, সঙ্গে লাল ঘোড়া।'

গোলাঘরের গেটের কাছে এসে একটা ঝোপের আড়ালে গাড়ি রাখল কিশোর। ভেতরে ঢোকার রাস্তাটা আগাছায় ভর্তি। 'চলো, দেখি।'

গাড়ি থেকে নেমে গোলাঘরের দিকে এগোল দুজন। হঠাৎ ভেতর থেকে কথার শব্দ শোনা গেল। 'আমি দিঘিতে যেতে চাই না। আমি বাড়ি যেতে চাই!' তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল।

ছোট মানুষের চিৎকারের মতোই তো মনে হলো, ভাবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

তোমরা আমাকে চেনো?

কিশোর।

পা টিপে টিপে পুরোনো গোলাবাড়িটার একটা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল দুজন। সময়মতোই এসেছে। দুজন লোক আর একজন মহিলাকে দেখতে পেল। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে দুজনকে চিনতে পেরে চমকে গেল কিশোর। লোক দুজনের একজন হলো মিস্টার হেনরি স্মিথ, আর মহিলাটি মিসেস স্মিথ। নীল অর্কিডের ফর্মুলা চুরি করতে না পেরে এখন নতুন শয়তানিতে মেতেছে।

মিস্টার স্মিথ ছোট একটা মেয়েকে ধরে রেখেছে। ছুটে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে মেয়েটা। স্মিথের সঙ্গের দ্বিতীয় লোকটা বেশ গাট্টাগোট্টা, মাথায় কালো চুল, সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটি বাচ্চা ছেলেকে। ছেলেটাও ছুটে যাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছে, হাত-পা ছুড়ছে।

'থামো! থামো বলছি!' ধমক দিল লোকটা। কিন্তু কথা শুনল না ছেলেটা।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল।

বাচ্চা দুটোকে একটা গাড়ির দিকে নিয়ে চলল ওরা। কালো রঙের একটা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের সিটে ফেলল বাচ্চা দুটোকে। নিজেরা বসল সামনের সিটে। ড্রাইভিং সিটে বসল মহিলা। গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

'জলদি চলো!' রবিনকে বলে দৌড় দিল কিশোর।

নিজেদের গাড়িতে ফিরে এল ওরা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গ্রামের রাস্তা ধরে সামনের গাড়িটাকে অনুসরণ করতে লাগল। হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল কিশোর। ওর গাড়ির গতি কমে যাচ্ছে। তেলের মিটারের কাঁটাটা 'শূন্য' দেখাচ্ছে। তেল নেই ট্যাংকে। ইঞ্জিন থেমে গেল। গাড়িটাকে রাস্তার পাশে নামিয়ে আনল কিশোর।

এসব যখন ঘটছে, রবিন তখন তাকিয়ে আছে স্টেশন ওয়াগনটার দিকে। গাড়িটার ওপর থেকে চোখ সরায়নি ও। সামনে রাস্তাটা দুই ভাগ হয়ে দুই দিকে চলে গেছে। বাঁ দিকের রাস্তাটা দিয়ে চলে গেল গাড়িটা।

'দূর!' হতাশায় স্টিয়ারিং হুইলে থাপ্পড় মারল কিশোর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'লাইসেন্স নম্বর যে নেব, সে রকম কাছাকাছিও যেতে পারিনি গাড়িটার। কোথায় যাচ্ছে যদি জানতে পারতাম। বেচারা ছেলেমেয়ে দুটোর জন্য দুঃখ হচ্ছে আমার। গাড়িতে তেল ফুরোবারও সময় পেল না আর। যখন রওনা হয়েছিলাম, তখন কিন্তু মিটারটা দেখেছি আমি। "ফুল" ছিল।'

'হ্যাঁ, দেখেছি,' উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'ওই লোকগুলোর পিছু নিতে পারলে ভালো হতো।'

'কীভাবে?'

'বুঝতে পারছি না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'আজ সন্ধ্যায় পার্কে ওই ভুতুড়ে মূর্তির অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

'একটা ভূতের ওপর নির্ভর করবে?'

রবিনের কথার জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গেল কিশোর। একটা ট্রাক আসতে দেখেছে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ড্রাইভারকে থামাল ও। ওদের গাড়িটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা গ্যাস স্টেশনে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করল। ড্রাইভার লোকটা ভালো। রাজি হলো। তবে স্টেশনে নিয়ে যেতে নয়, খানিকটা তেল দিতে। কারণ, সে যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে কাছাকাছি কোনো পেট্রল পাম্প নেই। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে নিজের গাড়ি থেকে একটা তেলের ক্যান বের করে আনল কিশোর। পাইপের সাহায্যে ক্যানে তেল ভরে দিল ড্রাইভার। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে ক্যান নিয়ে ফিরে এল কিশোর। গাড়ির ট্যাংকে তেল ভরে নিল।

প্রথমবারই যে পুলিশ ফাঁড়িটা দেখল কিশোর, সেখানে থেমে বাচ্চা দুটো আর স্টেশন ওয়াগনটার কথা জানাল। তবে লোকগুলোকে খুঁজে পাবে কি না পুলিশ, যথেষ্ট সন্দেহ আছে ওর। কারণ, লোকগুলোকে ধরার মতো তেমন কোনো সূত্র দিতে পারেনি।

তারপর আবার তেল ফুরোবার আগেই একটা গ্যাস স্টেশন থেকে তেল ভরে নিল কিশোর। আপাতত আর কিছু করার নেই। তাই বাড়ি ফিরে চলল। পথে রবিনদের বাড়িতে নামিয়ে দিল রবিনকে।

'আমাকে ফোন কোরো,' রবিন বলল। 'কী ঘটছে জানিয়ো। আর, সাবধানে থেকো।'

'থাকব,' কথা দিল কিশোর। আবার গাড়ি চালাল। বাড়ি ফিরে এল।

আকাশে মেঘ জমেছে। আবহাওয়া ঠান্ডা হয়ে আসছে। বৃষ্টি হতে পারে।

বাড়ি পৌঁছে প্রথমে খেয়ে নিল কিশোর। তারপর গরম কাপড় পরে নিয়ে সন্ধ্যা হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। বিকেল পেরিয়ে যেতেই রেইনকোটটা গায়ে দিয়ে পার্কের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল ও। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে তখন।

এই বৃষ্টির মধ্যেও অনেকে জগিং করছে। ওদের পাশ কাটিয়ে বনের কাছে চলে এল কিশোর। যে জায়গাটা দিয়ে আগের দিন ভূতটা অদৃশ্য হয়েছিল, সেখানে এসে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। অপেক্ষা করতে করতে যখন মনে হলো, ভূতটা আর আসবেই না, ঠিক তখন দেখা দিল ওটা। সেই লম্বা সাদা রঙের হুডওয়ালা আলখেল্লা পরেছে। তার ওপর একটা রেইনকোট চাপিয়েছে। কিশোরকে দেখে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। কাছে আসার পর যেন ঝটকা দিয়ে সামনে এগিয়ে এল একটা হাত। কিশোরের হাতে একটা নোট গুঁজে দিল। কী লেখা আছে পড়ার জন্য মরিয়া হয়ে আছে কিশোর। তাড়াতাড়ি নোটটা খুলে পড়ল :

> কঠিন পরিশ্রম করে এলে, তার জন্য ধন্যবাদ। তবে যেভাবে শেষ হলো তোমাদের অভিযান, তার জন্য দুঃখই পাচ্ছি আমি। এখন তোমাকে বুড়ো নাবিকের কাছে গিয়ে পুরোনো রিভারবোটটা ব্যবহার করতে হবে।— পারিবারিক ভূত।

আট

লেখাটা পড়ে ভূতটাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য মুখ তুলল কিশোর। অবাক হয়ে দেখল, নেই ওটা। হঠাৎ যেভাবে উদয় হয়েছিল, সেভাবেই অদৃশ্য হয়েছে।

সামনে তাকাল কিশোর। পেছনে। দুই পাশে। কোথাও নেই ভূতটা। ওর নোট পড়ার সুযোগে প্রথমবার যেমন উধাও হয়ে গিয়েছিল, এবারও তা-ই করল। জঙ্গলেই ঢুকেছে। পার্কে নেই, জানা কথা, তাহলে এই গোধূলির অস্পষ্ট আলোতেও সাদা আলখেল্লা পরা একটা মূর্তিকে ভালোমতোই দেখা যাওয়ার কথা।

নাহ্, আপাতত ওই 'পারিবারিক ভূত'কে নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে ও যে নির্দেশ দিয়েছে, সেটা পালন করাই ভালো, ভাবল কিশোর।

আবার পুলিশের সঙ্গে দেখা করল। তবে গুরুত্ব দিল না পুলিশ। ভাবল, কোনো রসিক লোকের তামাশা। বিষয়টা ওদের কাছে ছেলেমানুষি মনে হলো। কিশোর বুঝতে পারছে, যা করার ওর নিজেকেই করতে হবে।

বাড়ি ফিরে এসে চাচাকে দেখে সব কথা খুলে বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'চাচা, রিভারবোটের মালিক কোনো বুড়ো নাবিককে চেনো?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন রাশেদ পাশা। তারপর বললেন, 'নদীর ডকে একজন বুড়ো নাবিককে একটা রিভারবোট রাখতে দেখেছি, অনেক দিন আগে। একেবারেই সন্ন্যাসী লোকটা। একটা চরিত্র বটে।'

'এখনো বেঁচে আছে?' জানতে চাইল কিশোর।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন রাশেদ পাশা। 'শুনেছি, বছর খানেক আগে ওই নাবিক তার বোটসহ নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমার ধারণা, নদীর ডক থেকে সাগরের দিকে চলে গেছে, ভাটির কোনোখানে।'

'ওর বোটটা দেখতে কেমন?'

'একটা পুরোনো স্টিমার। নাম "রকি বিচ গোল্ড"।'

'সুন্দর নাম। কিন্তু পার্কের পারিবারিক ভূতের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক? যা-ই হোক, যদি ওই বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটোকে উদ্ধার করতে হয়, সময় নষ্ট করা যাবে না। রাতের বেলা এখন গিয়ে লাভ নেই। এই অন্ধকারে কিছুই খুঁজে পাব না।'

তাড়াতাড়ি মুসা আর রবিনকে ফোন করল কিশোর। ছেলেমেয়ে দুটোকে খুঁজতে যাওয়ার কথা জানিয়ে বলল, 'কাল সকালে যেতে হবে আমাদের। পেট ভরে খেয়ে নিয়ো। প্রচুর কাজ আছে আমাদের।'

রওনা হওয়ার আগে পার্কে গিয়ে কিছুক্ষণ জগিং করে নিলে কেমন হয়?' রবিন পরামর্শ দিল।

'ভালোই হয়, যদি পারিবারিক ভূতটার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।' জবাব দিল কিশোর। 'তবে দিনের বেলা হাজির হবে কি না সন্দেহ। তবু যদি আসে, মিস করা উচিত হবে না। সকাল সাতটায় তোমাকে বাড়ি থেকে তুলে নেব।'

কিন্তু ওদের হতাশ করল ভূতটা। সকালবেলা পার্কে এল না।

'ধুত্তোর!' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা। 'পার্কে আসার জন্য এত তাড়াহুড়া করে খেলাম, পেটই ভরেনি। এদিকে ভূতটা তো এল না।'

'এক-আধবেলা কম খেলে কিছু হয় না,' রবিন বলল। তারপর কিশোরকে বলল, 'ভূতও এল না, তোমার কথামতো সব টিভি চ্যানেলের নিউজ দেখেছি, বাচ্চাগুলোর নিখোঁজ হওয়ার খবরও কিছু বলল না।'

'পুলিশই যদি খুঁজে বের করতে না পারে,' মুসা বলল, 'আমরা করব কীভাবে?'

'কীভাবে করব, জানি না,' জবাব দিল রবিন, 'তবে করব। এর আগেও অনেক জটিল কেসের সমাধান করেছি আমরা, তাই না?'

'কিন্তু ভূতের সঙ্গে কারবার করা...' বলতে গেল মুসা।

বাধা দিল কিশোর, 'ভূতের সঙ্গে কারবার করলে অসুবিধা কী? এ ভূতটাকে তো ভালোই মনে হচ্ছে।'

কিশোরের গাড়িতে করে নদীর দিকে এগোচ্ছে ওরা। কিশোর কী করতে চায়, জানতে চাইল রবিন। কোথায় সূত্র খোঁজার কথা ভাবছে, তা-ও জিজ্ঞেস করল।

'স্থানীয় একজন জেলের কাছে যাব,' কিশোর বলল। 'ইয়ার্ডের কর্মচারী বোরিস একবার রকি বিচ নদীর মাঝখানের রকি আইল্যান্ডে বেড়াতে গিয়েছিল। ওখানে ক্যাম্পিং করার সময় টম নামের একটা লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। রকি বিচ নদীর বিশেষজ্ঞ ওই লোক। তাকে, অর্থাৎ টমকে আমরা খুঁজে বের করব।'

'দ্বীপে গিয়ে?' রবিনের প্রশ্ন। 'ওখানে পৌঁছাব কী করে আমরা? সাঁতরে?'

'গেলেই দেখতে পাবে, চমক আছে তোমাদের জন্য,' কিশোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

facebook.com/shebaprokashoni.fanpage

হাতে একটা নোট গুঁজে দিল

জবাব দিল। 'চলো আগে, নদীর ধারে যাই।'

নদীর কিনারে পৌঁছে, গাড়ি রেখে, দুই বন্ধুকে নিয়ে একটা বোট ভাড়া করার ডকে চলে এল কিশোর। একটা চকচকে, লাল রঙের বোট দেখা গেল। বড় বড় অক্ষরে সাদা রঙে বোটটার গায়ে নাম লেখা রয়েছে 'ওয়াটার বার্ড'।

'কি, সুন্দর না?' বলল কিশোর।

'কার বোট?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগেই বোলো না। আমি আন্দাজ করি তোমার চাচা কিনেছেন এটা। গতকাল।'

হাসল কিশোর। 'উঁহু, চাচা কেনেননি, ফোনে ভাড়া করে রেখেছিলেন। দুই মাসের জন্য। এই সময়ের মধ্যে যখন খুশি এটা ব্যবহার করতে পারব আমরা। উইকএন্ডে বেড়াতে যেতে পারব।'

'দারুণ হবে,' উত্তেজিত কণ্ঠে রবিন বলল। 'নদীর উজানে যত দূর পারি চলে যাব আমরা। শুনেছি, নদীটার দুই পাড়ের দৃশ্য নাকি অপূর্ব। চলো, উজানের দিকেই যাই।'

আবার হাসল কিশোর। 'বোটটা দেখেই ভুলে গেলে? আজ আমরা বেড়াতে আসিনি, তদন্ত করতে এসেছি। এখন রকি আইল্যান্ডে যাব আমরা। ওঠো, বোটে ওঠো।'

চকচকে বোটটাতে উঠে বসল তিনজন। হুইলে বসল কিশোর। শিপগিন নদীর পানি দুই ভাগ করে দিয়ে ছুটে চলল ওয়াটার বার্ড।

'দারুণ! দারুণ!' বোটের গতির প্রশংসা করল মুসা। 'মনে হচ্ছে সিল্কের মতো মসৃণ।'

'ইশ, ওসব বাচ্চা খোঁজাখুঁজির কাজ বাদ দিয়ে যদি এখন ঘুরতে যেতে পারতাম,' আফসোস করল রবিন।

তার দুই সঙ্গীও একমত হলো, তবে কাজ বাদ দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, মনে করিয়ে দিল কিশোর।

কীভাবে যেতে হবে বোরিসের কাছ থেকে জেনে এসেছে কিশোর। সেই মতো এগিয়ে নদীর মাঝখানে একটা চরার কাছে পৌঁছাল। সারা দ্বীপটায় ছোট আকারের গাছ জন্মে আছে। ঠিক মাঝখানে বড় একটা উঁচু পাইনগাছ মাথা তুলে রেখেছে। বোট বাঁধার জন্য ছোট একটা ডক খুঁজে বের করল ওরা। ছোট একটা ছাউনিও আছে। ছাউনির সামনে শুয়ে ছিল একটা কুকুর। বোটের শব্দে প্রথমে কান খাড়া করল, তারপর মাথা উঁচু করে তাকাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

facebook.com/shebaprokashoni.fanpage

একটা চোখ মিটমিট করল। 'ঘাউক' করে ভারী এক হাঁক ছাড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। লম্বা, পাতলা একজন লোক বেরিয়ে এল। ওর হাতের থাবা আর পায়ের পাতা—সবই দেহের তুলনায় অতিরিক্ত বড়। এমনভাবে মাথা ঝাড়া দিতে লাগল, মনে হলো সদ্য ঘুম থেকে জেগেছে। মাথার লম্বা সোনালি চুল বাতাসে উড়ছে। আঙুল দিয়ে চেপে সেগুলো জায়গামতো বসিয়ে দিল।

'আল্লাহই জানে, ভালো না খারাপ,' বিড়বিড় করল মুসা।

'গুড মর্নিং,' জোরে বলল কিশোর। 'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আপনি নিশ্চয় টম, বিখ্যাত জেলে।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল লোকটা, 'খাবারের জন্য মাছ শিকার করলেও পেশায় আমি জেলে নই। আমি নদীতে বাস করতে ভালোবাসি। আমাকে রিভারম্যান বলতে পারো। এখানে আমি আর ওয়াল্টার ছাড়া আর কেউ থাকে না।' নিচু হয়ে কুকুরটার মাথা চাপড়ে দিল লোকটা। বোঝা গেল, কুকুরটার নাম ওয়াল্টার। 'মাঝেমধ্যে অতিথি এলে খুশিই লাগে। এসো। কী করতে পারি তোমাদের জন্য?'

'আমাকে বলা হয়েছে,' কিশোর বলল, 'আপনি আমাকে হারানো জাহাজ সি কুইনের খোঁজ দিতে পারবেন।'

'হারায়নি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল টম। 'ওই গুজব একেবারেই মিথ্যে। মানুষ আসলে ওটাকে ভয় পায়, ওটাকে নিয়ে আলোচনা করতে চায় না।'

'কেন?'

'জানি না। ইদানীং কী অবস্থায় রয়েছে সি কুইন, তা-ও জানি না। হয়তো ইঁদুর, কাঠবিড়ালি আর পাখির বাস। হয়তো বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে একসময়কার সুন্দর স্টিমারটার।'

'সেটাই দেখতে এসেছি,' কিশোর বলল। 'আপনি কি ওটার কাছে নিয়ে যেতে পারবেন আমাদের?'

জবাব দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল টম। তিন কিশোরের আগ্রহ জরিপ করল বোধ হয়। তারপর বলল, 'অ্যাডভেঞ্চার লাভার, তাই না? অভিযান ভালো লাগে?' হাসিমুখে প্রশ্ন করল ও। তারপর বলল, 'না নিতে পারার কোনো কারণ নেই। তবে যাওয়ার আগে আমার ঘরে এসে বসো। খেয়ে নিয়ে তারপর বেরোই।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মুসা। পেটে হাত বুলিয়ে বলল, 'নদীর হাওয়ায় একেবারে খালি হয়ে গেছে।'

হাসিমুখে ওদের ঘরে নিয়ে গেল টম। কোল্ড ড্রিংক পেশ করে দিল। তাজা ফল কেটে দিল। মজা করেই খেতে বসল সবাই। খেতে খেতে ওদের আসার উদ্দেশ্য লোকটাকে জানাল কিশোর।

খাওয়ার পর একটা খুঁটির সঙ্গে কুকুরটাকে বাঁধল প্রথমে টম। তারপর একটা দোমড়ানো ফেল্ট হ্যাট মাথায় দিল। তারপর ছেলেদের সঙ্গে বোটে চড়ে নদীর ভাটির দিকে চলল।

নয়

মাইল খানেক এগোনোর পর একটা ছায়াঢাকা খাল দেখিয়ে সেটাতে ঢুকতে বলল টম।

দ্বিধা করল কিশোর। 'বোট নিয়ে ওখানে ঢোকাটা কি নিরাপদ? পানিতে বেরিয়ে থাকা শিকড় কিংবা মরা গাছ থাকলে বোটের ক্ষতি হতে পারে।'

'খালের মাঝামাঝি যদি থাকো, তাহলে কিছু হবে না,' টম বলল। সাবধানে পথ দেখাতে লাগল। দশ মিনিট পর চেঁচিয়ে উঠল, 'থামো! ওই যে স্টিমারটা!'

তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। নদীর কিনারে সারি দিয়ে জন্মে থাকা গাছের ধারে চুপচাপ ভেসে রয়েছে একটা ছোট স্টিমার। সাদা রং করা হয়েছিল। তবে এখন বেশির ভাগ জায়গারই রং চটে গেছে। পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ একটা জিনিস।

গলার স্বর নামিয়ে ভয়ে ভয়ে মুসা বলল, 'শুনেছি, পড়ে থাকলে জলদানব হয়ে যায় স্টিমার। ভূতে আসর করে। এটার তেমন কিছু হয়নি তো? কেউ থাকে নাকি ওটাতে? একটা আলো দেখলাম বলে মনে হলো?'

'অবাক কাণ্ড!' টম জবাব দিল। 'ওটাতে কেউ থাকে বলে তো জানতাম না। চলো তো, দেখি।' ভেসে ভেসে জাহাজটার দিকে এগোল ওয়াটার বার্ড। আরও কাছাকাছি হলে মুখের কাছে দুই হাত জড়ো করে নাবিকদের ভঙ্গিতে চিৎকার করে বলল টম, 'শিপ আহয়, সি কুইন!' সাধারণ ভাষায় এর মানে হলো, এই যে শুনছ, সি কুইন জাহাজ!

ডেকে এল না কেউ। তবে একটা বাজখাঁই কণ্ঠে জবাব এল, 'খবরদার, কাছে এসো না! ভালো হবে না!'

রীতিমতো কাঁপতে শুরু করল মুসা। 'বললাম না, জলদানব হয়ে গেছে! ওটা কোনো মানুষের কণ্ঠ নয়! কিশোর, প্লিজ, ফিরে চলো! আর এগিয়ো না!'

'দূর, কিসের জলদানব,' রবিন বলল। 'যতসব ফালতু কথা। মজাটা তো মাত্র শুরু হয়েছে। কে আছে ওটার ভেতরে, দেখা দরকার।'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল স্টিমারের ভেতরে। তার পর পরই একটা বাচ্চা ছেলের কণ্ঠ, 'ছাড়ো আমাকে! এখানে তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই না! আমি বাড়ি যেতে চাই!'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। তিনজনের মনে একই প্রশ্ন, ওই বাচ্চা দুটোর একটা না তো? কিশোর ভাবছে, জাহাজে চড়া ঠিক হবে কি না। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল দুই সহকারীকে।

'চড়াই উচিত, যদিও খুবই বিপজ্জনক হবে,' মুসা বলল, জলদানবের ভয় চলে গেছে তার মন থেকে। 'স্টিমারের ভেতরে যে লোকগুলো রয়েছে, ওরা বাচ্চাগুলোরও ক্ষতি করতে পারে, আমাদেরও।'

হাত তুলে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করল টম। ফিসফিস করে কিশোরকে বলল, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। আমি দেখে আসি, কী হচ্ছে।'

কিন্তু তার আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে কিশোর। আস্তে করে স্টিমারের গায়ে বোটটাকে ঠেকিয়ে দিয়ে জাহাজের দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। একটা দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, ঠিক এ সময় রেলিংয়ের পাশে এসে দাঁড়াল একজন লোক। পরনে নাবিকের পোশাক। রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এসে কিশোরের দিকে তাকাল। লোকটাকে চিনতে পারল কিশোর। গাট্টাগোট্টা, কালো চুলওয়ালা। সেদিন লাল ঘোড়াওয়ালা শূন্য বাড়িতে যাকে দেখেছিল, কিডন্যাপারদের দলের লোক।

'উঠেছ কেন?' ধমক দিয়ে কিশোরকে বলল লোকটা। 'থামো। নেমে যাও।'

লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটানে ধাতব দরজাটা খুলে সিঁড়ি ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল কিশোর। পেছনে ঘটাং করে লেগে গেল ধাতব দরজাটা।

একটা বদ্ধ জায়গায় ঢুকেছে ও। এখান থেকে বেরোনো দরকার, ভাবছে কিশোর। আধো অন্ধকারে ধাতব দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চলল ও। দরজা খুঁজছে। বাতাস এখানে ভীষণ ভারী। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। তবে খুঁজতেই থাকল। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে আঙুল ঠেকল একটা কাঠের ডান্ডার ওপর।

এক পাশ ধরে টান দিয়ে ডান্ডাটা উঁচু করে ফেলল ও। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে খুলে গেল একটা দরজা। তার ওপাশে একটা বদ্ধ বারান্দা। বারান্দার দুই পাশে কয়েকটা করে দরজা। বুঝতে পারল, ওগুলো নাবিকদের থাকার ঘর।

তাজা বাতাস পেয়ে ঘন ঘন দম নিতে লাগল ও। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল নিঃশ্বাস। উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে চলল বারান্দার শেষ মাথার দিকে। ওখানে রয়েছে ওপরে ওঠার একটা সিঁড়ি।

ওটার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে কিশোর, আবার শোনা গেল বাচ্চাদের চিৎকার, 'আমি যাব না! আমি যাব না!' বলল একটা বাচ্চা। আরেকটা কেঁদে উঠে বলল, 'আম্মা! আব্বা! কোথায় তোমরা? আমাদের এসে নিয়ে যাও!'

আর দেরি করল না কিশোর। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সিঁড়ির মাথার ছোট চৌকোনা জায়গাটায়। সেখান থেকে ছোট ডাইনিং এরিয়ায়। লাউঞ্জে বেরোবার আগের মুহূর্তে দেখল, দুজন লোক—একজন সেই গাট্টাগোট্টা লোকটা, আরেকজন মিস্টার স্মিথ—একটা বাচ্চা ছেলে আর একটা মেয়েকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সরু বারান্দা ধরে ওদের পিছু নিল কিশোর। বারান্দার মাথায় একটা ফোকর। ওটা একটা দরজা, জাহাজের একপাশ দিয়ে বেরোনোর। দরজার কাছ থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে একেবারে পানির ওপর। সিঁড়ির মাথায় যখন পৌঁছাল কিশোর, কিডন্যাপাররা ততক্ষণে অর্ধেক পথ নেমে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ পেছনে কারও অস্তিত্ব টের পেল ও। কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। সাদা পোশাক পরা একটা মূর্তি। পার্কের সেই ভূতটা!

'তোমার বোট নিয়ে আমাকে অনুসরণ করে পুরোনো বোটহাউসে যেয়ো,' ভূতটা বলল।

দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। নির্দেশ মানবে কি না ভাবছে। ওদিকে কানে আসছে বাচ্চা দুটোর চিৎকার। কিশোর বুঝতে পারছে, সে একা ওই লোকগুলোর হাত থেকে বাচ্চাগুলোকে মুক্ত করতে পারবে না। সাহায্য দরকার।

দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে ভূতটার পেছনে ছুটল কিশোর। বারান্দা দিয়ে চলে এল জাহাজের অন্য পাশে। সেখানে আরেকটা দরজা। কিশোর ওখানে পৌঁছার আগেই খুলে গেল দরজাটা। টম এসে দাঁড়াল।

কিশোরের কাছে এল। আবার দরজাটা খুলে বাইরে বেরোল দুজন। হাতের কাছেই পাওয়া গেল দড়ির সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা। নিচ থেকে লাফিয়ে নামল মোটরবোটে।

কী ঘটেছে দ্রুত সংক্ষেপে জানাল কিশোর। ইঞ্জিন চালু করল রবিন। হুইল ধরল এবার টম। দক্ষ হাতে বোটটাকে দ্রুত নিয়ে গেল স্টিমারের অন্য পাশে।

চোখে পড়ল, পানির ওপর ঝুঁকে আসা ডালপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কিডন্যাপারদের বোটটা। ঠিক তার পেছনেই রয়েছে আরেকটা বোট। তাতে বসে আছে ভূতটা। ওয়াটার বার্ডের গতি বাড়িয়ে দিল টম। বোট দুটোকে অনুসরণ করে ছুটল।

বিপজ্জনক খালে পানির নিচে বেরিয়ে থাকা শিকড় আর মরা গাছ থাকার আশঙ্কা খুবই বেশি। সেগুলোর কোনোটাতে বাড়ি খেলে ভেঙে যেতে পারে বোটের তলা। সাবধানে সেসব এড়িয়ে ছুটে চলল টম। ভূতের বোটটার কাছে চলে এল।

ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর, 'ছেলেমেয়ে দুটোকে কারা নিয়ে যাচ্ছে?'

'আমার আঙ্কেল সাইমন টপলার,' জবাব দিল ভূতটা। 'ওদের আটকে রেখে জিম্মিপণ আদায় করতে চায়।'

'ওদের কে কিডন্যাপ করেছে?'

'আমার আঙ্কেল কিংবা তার দোস্তরা।'

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল কিশোর।

'আঙ্কেলের উদ্দেশ্য সফল হতে দেব না আমরা। জিম্মির টাকা নিয়ে পালাতে দেব না,' ভূতটা বলল। 'ওদের থামতেই হবে।' গতি বাড়িয়ে দিল বোটের।

পরিস্থিতির জরুরি অবস্থাটা বুঝতে পারছে কিশোর। 'টম, আরও জোরে চালানো যায় না? সামনের বোটটার কাছাকাছি যেতেই হবে।'

তীব্র গতিতে ছুটছে ভূতের বোট। গতি বাড়িয়ে আবার ওটার কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করল টম। কয়েক মিনিট পর সামনে তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে বাঁয়ের একটা বড় পুরোনো বোট হাউসে ঢুকে গেল ভূতের বোটটা।

ছুটে গেল টম। ওপর থেকে নেমে এল ডকের করোগেটেড টিনের তৈরি একটা দরজা। বোটের ওপর এসে আটকে গেল। দরজাটা নামার আগেই বোটের সামনের দিকে লাফিয়ে পড়েছে টম ও কিশোর। রবিন আর মুসা রয়ে গেছে পেছনে। আলাদা হয়ে গেছে কিশোরদের কাছ থেকে। দরজাটা খোলার জন্য টানাটানি করতে লাগল ওরা। লাভ হলো না।

অন্য পাশে টম জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, 'কী করব এখন?'

'এই বাড়িতে ঢুকে দেখব,' ডক হাউসটা দেখাল কিশোর। 'যদি পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে না আসি, আমাকে খুঁজতে আসবেন।'

বোটের কিনারা দিয়ে ভূতের বোটটায় উঠে এল কিশোর। আগেই অদৃশ্য হয়েছে ভূতটা।

ভূতের বোটের কিনারে গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে কিডন্যাপারদের বোট। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বোট হাউসের দোতলায়।

কোনো শব্দ নেই। কান পেতে আছে কিশোর। আচমকা মাথার ওপরের একটা তক্তা মচমচ করে উঠল। পরক্ষণে শোনা গেল একজন লোকের রুক্ষ কণ্ঠ। আদেশের সুরে বলল, 'যেখানে আছ, সেখানেই থাকো। তুমি আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না, ভুয়া ভূত কোথাকার!'

'ভুয়া না বলে আগের মতো পারিবারিকই বলো, সেটাই তো ভালো। পারিবারিক ভূত,' জবাব দিল আরেকটা কণ্ঠ। তারপর বলল, 'আঙ্কেল সাইমন টপলার, তোমার শয়তানি খেলার এখানেই ইতি! জিম্মিপণের টাকা তুমি পাবে না।'

'কে ঠেকাবে? তুমি? ভুলে যেয়ো না, ছেলেমেয়েগুলো আমার কবজায় রয়েছে।' ধমকে উঠল সাইমন। কিশোর বুঝল, কালো চুলওয়ালা লোকটাই 'ভূতের' আঙ্কেল সাইমন টপলার।

'কিন্তু আমরা বাড়ি যেতে চাই,' ককিয়ে উঠল একটা বাচ্চা।

ওপরতলায় যাওয়ার সিঁড়ি চোখে পড়ল কিশোরের। নিঃশব্দে উঠতে শুরু করল ও। একই সঙ্গে ভাবনা চলেছে মগজে। নিরাপদে বাচ্চা দুটোকে মুক্ত করার বুদ্ধি খুঁজছে। বুঝতে পারছে, ভূতের সাহায্য দরকার ওর।

ওপরতলায় একটা ছোট রান্নাঘরে ঢুকেছে সিঁড়িটা। সেটার লাগোয়া কাঠের দরজা লাগানো আরেকটা ঘর দেখতে পেল কিশোর। মোটা তক্তার দণ্ড আড়াআড়ি লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে দরজাটা। ফোকরগুলো দিয়ে ওপাশটা দেখা যায়। বাচ্চা দুটোকে চোখে পড়ল ওর। ওরাও ওকে দেখতে পেয়ে কাঁদতে শুরু করল।

ঠোঁটে আঙুল রেখে ওদের কথা না বলতে ইশারা করল কিশোর। হাসল। ফোকরের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোমাদের মুক্ত করতে এসেছি। ভয় পেয়ো না। চিৎকার কোরো না।'

'দরজাটায় তালা দেওয়া,' কম্পিত কণ্ঠে বলল ছেলেটা।

ভালো করে দেখল কিশোর। তালা দেওয়া নয়। মোটা একটা কাঠের ডান্ডা আড়াআড়ি রেখে বাইরে থেকে আটকে দেওয়া হয়েছে। ডান্ডাটা তুলে নিতেই খুলে গেল দরজাটা।

'এসো, আমার সঙ্গে এসো!' দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বাচ্চা দুটোকে ডাকল কিশোর।

ওদের নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল। নিচে নেমে দেখল, বোটের ওপর থেকে বোট হাউসের দরজাটা সরাতে সক্ষম হয়েছে টম ও মুসা মিলে। ইঞ্জিনের কাছে বসে আছে রবিন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে ওয়াটার বার্ডে উঠল কিশোর। এই সময় বোট হাউসের সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল।

'টম, জলদি বোট ছাড়ুন!' কিশোর বলল।

তবে বোট নিয়ে পিছিয়ে আসার আগেই একটা হর্নের জোরালো শব্দ শোনা গেল। কোস্ট গার্ডের একটা পেট্রল বোট এসে থামল ওয়াটার বার্ডের পেছনে। উঠে দাঁড়ালেন দুজন অফিসার। তাঁদের পেছনে রয়েছেন আরও দুজন মানুষ—একজন পুরুষ, একজন মহিলা। বাচ্চা দুটোকে দেখেই ওদের নাম ধরে চিৎকার করতে লাগলেন। কেঁদে ফেললেন মহিলা।

চমকে গিয়ে ফিরে তাকাল বাচ্চা দুটো। চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'আম্মা! আব্বা!'

বাচ্চা দুটো যখন হাঁচড়েপাঁচড়ে কোস্ট গার্ডের বোটে ওঠার চেষ্টা করছে, বোট হাউসের সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এল কালো চুলওয়ালা লোকটা। চিৎকার করে আদেশ দিল, 'থামো! আমার পুরস্কারের টাকা পরিশোধ না করে কোথাও যেতে পারবে না তোমরা! আমি ওদের খুঁজে বের করেছি!'

'তুমি ওদের খুঁজে বের করোনি, তুমি ওদের কিডন্যাপ করেছ!' পেছন থেকে বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। 'আঙ্কেল সাইমন, তুমি একটা ডাকাত! একটা কিডন্যাপার!'

ভূতটা! এখন ওর মাথার হুডটা সরাল। কিশোর দেখল, একজন সুদর্শন তরুণ। বাচ্চা দুটোর মা-বাবার দিকে তাকিয়ে বলল নকল ভূত, 'আঙ্কেল সাইমনকে একটা পয়সাও দেবেন না। ওর দুই দোস্তকে নিয়ে আপনাদের ছেলেমেয়েদের কিডন্যাপ করেছে ও। এখন আপনাদের কাছে ভালো সাজার জন্য পুরস্কার চাইছে। আড়াল থেকে আমি ওদের পরিকল্পনা শুনে ফেলেছিলাম। তখনই ঠিক করেছিলাম, বাধা দেব, কোনোমতেই পার পেতে দেব না ওদের। কিন্তু পুলিশকে জানাতে মন চায়নি। হাজার হোক, ও আমার আঙ্কেল। আমি জানি, বাচ্চা দুটোর কোনো ক্ষতি করবে না ও। তাই আমি ঠিক করলাম, কিশোর পাশাকে জানাব। ও আর ওর দুই বন্ধু মুসা ও রবিন অনেক বড় গোয়েন্দা। অনেক জটিল কেসের সমাধান করেছে। ওদের জানালে বাচ্চা দুটোকে খুঁজে বের করে আপনাদের হাতে পৌঁছে দেবে, জানতাম। তাই কৌশলে ওদের সাহায্য নিলাম। সরাসরি যোগাযোগ না করে ভূত সেজে কিশোরের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আমি কে, সেটা ওকে জানাতে চাইনি। আমি ভেবেছিলাম, আমার ছদ্মবেশ ভেদ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

facebook.com/shebaprokashoni.fanpage

টম, জলদি বোট ছাড়ুন!

AMARBOI.COM

পারবে না ও। যা-ই হোক, ওর সাহায্য নিয়ে ভালোই করেছি।'

একজন অফিসার বললেন, 'কিশোর পাশাকে আমি চিনি।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিশোর, ফাঁড়ির পুলিশ এই কিডন্যাপিংয়ের কথা রকি বিচ পুলিশকে জানিয়েছে। রকি বিচ থানার ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আমরা তখন তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য তোমাদের বাড়িতে ফোন করেছি। তোমার চাচি জানিয়েছেন, তুমি খুঁজতে তোমরা রিভারম্যান টমের সঙ্গে দেখা করতে গেছ। টমকে আমরা চিনি। বাচ্চা দুটোর বাবা-মাকে নিয়ে তখন ওকে খুঁজতে বেরিয়েছি আমরা। কুকুরটাকে খুঁটিতে বাঁধা দেখে বুঝেছি, তোমাদের সঙ্গেই গেছে ও। এই অঞ্চল আমাদের চেনা। এদিকে আসতে অনেক মোটর বোটের শব্দ কানে এসেছে আমাদের। তাই খালে ঢুকে দেখতে এসেছিলাম।'

ওপরতলা থেকে সাইমন টপলারের দুই বন্ধু মিস্টার স্মিথ ও তার স্ত্রীকে হাতকড়া পরিয়ে নামিয়ে আনলেন অফিসাররা। চিনতে পেরে চমকে গেল মুসা ও রবিন। এবার আর পালাতে পারল না স্মিথ দম্পতি। নীরবে নতমুখে সাইমনের সঙ্গে কোস্ট গার্ডের বোটে উঠল ওরাও। চুপ করে ব্যথিত মুখে আঙ্কেলের দিকে তাকিয়ে রইল ছদ্মবেশী ভূত। তবে বাচ্চা দুটোকে বাবা-মায়ের কাছে দেখে খুশিও হলো।

জোরে জোরে চিৎকার করে কিশোর, তার দুই বন্ধু, আর ভূত'কে ধন্যবাদ দিল বাচ্চা দুটো। ওদের বাবা-মায়েরাও ধন্যবাদ দিলেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

হাসিমুখে টমের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'তবে আমাদের এই অভিজ্ঞ বুড়ো নাবিককে ছাড়া কোনোমতেই এদের ধরতে পারতাম না আমরা। বেশির ভাগ ধন্যবাদ তাঁরই পাওয়া উচিত।'

হাসিমুখে টম বলল, 'বেশি বলে আমাকে লজ্জা দিয়ো না। এখন তো দ্বীপে ফিরে যাব, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

'এক কাজ করো, আজকের দিনটা আমার দ্বীপে বেড়িয়ে যাও তোমরা,' টম বলল।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মুসা। 'ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম আমি। খাবারের অভাব নেই ওখানে। দ্বীপটাও সুন্দর। বেড়ানোর চমৎকার জায়গা।'

কিশোর আর রবিনও রাজি হলো। ছদ্মবেশী ভূতকেও সঙ্গে নিতে চাইল ওরা।

কিন্তু আঙ্কেলের জন্য মন খারাপ থাকায়, 'আরেক দিন যাব,' বলে ওদের দাওয়াত এড়িয়ে গেল তরুণ লোকটা। ●

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~